পঞ্চম অধ্যায়

জীবনাদর্শ

প্রিয় শিক্ষার্থী,

আমরা ইমান, আকিদা, সালাত এবং আখলাক সম্পর্কে জানলাম। উত্তম চরিত্র গঠনে এ সবই ইসলামের শিক্ষা। এ সবই আমরা আমাদের জীবনে প্রয়োগ করতে চাই। এখন একটু চিন্তা করে দেখোতো এমন কি কি কাজ আছে যা করলে আমরা একটি আদর্শ জীবন লাভ করতে পারব? কোন কোন আচরণ বা কাজ করলে আমরা বলতে পারব যে, আমরা উত্তম চরিত্রের অধিকারী, ভালো মানুষ। চিন্তা করো এবং শ্রেণির কাজের খাতায় লিখো। তারপর বন্ধুদের সাথে আলোচনা করে দেখো তোমার বন্ধুরা এ ব্যাপারে কি চিন্তা করছে।

এবার এসো জেনে নিই, আল্লাহ তা'আলা আমাদের আদর্শ জীবন গঠনের জন্য কি শিক্ষা দিয়েছেন।

আমাদের সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ তাঁর মনোনীত বান্দাদের প্রতি ওহী অবতীর্ণ করে আমাদেরকে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহর নিকট থেকে ওহীপ্রাপ্ত এ বান্দাগণই হলেন নবি ও রাসুল। আর যারা রাসুলুল্লাহ (সা.) -এর আদর্শ অনুসরণ করে নিজের জীবনকে আলোকিত ও মহিমান্বিত করেছেন তাঁরা হলেন আল্লাহর প্রিয় বন্ধু বা ওলী। আমরা মহান আল্লাহর ঐ সকল মহান নবি-রাসুল ও ওলীদের জীবনাদর্শ সম্পর্কে জানব। তাঁদের আদর্শ অনুসরণ করে আমাদের জীবন আলোকিত করব।

● মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)

আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সর্বশেষ নবি ও রাসুল। তাঁকে আমাদের জন্য পৃথিবীতে রহমতস্বরূপ প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন–

وَمَآ اَرۡسَلۡنٰكَ اِلَّا رَحۡمَةً لِّلۡعٰلَمِيۡنَ

অর্থ: 'আমি তো আপনাকে জগৎসমূহের রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি।' (সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ১০৭)

আরবের সমকালীন পরিবেশ

মহানবি (সা.)-এর আবির্ভাব সময়কালকে আইয়্যামে জাহেলিয়া বলা হতো। আইয়্যামে জাহেলিয়া অর্থ অজ্ঞতা ও বর্বরতার যুগ। এ সময় আরবের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা খুবই ভয়াবহ ছিল। সমগ্র আরববাসী শিরক ও পাপাচারে নিমজ্জিত ছিল। তারা মদ, জুয়া, নারী ও যুদ্ধ-বিগ্রহ নিয়ে নিমগ্ন থাকতো। তাদের মধ্যে ভালো-মন্দের কোনো পার্থক্য ছিল না। ঝগড়া-বিবাদ, চুরি-ডাকাতি, হত্যা, লুণ্ঠন, দুর্নীতি ও যুদ্ধ-বিগ্রহ-ই ছিল তাদের জীবন। তারা এক আল্লাহর পরিবর্তে বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি পূজা করত। পবিত্র কাবা গৃহে তখন ৩৬০টি দেবদেবীর মূর্তি ছিল।

এ সময় আরবের নারীদের অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। তাদের কোনো সামাজিক অধিকার বা মর্যাদা ছিল না। তাদেরকে ভোগের সামগ্রী মনে করা হতো। তারা কন্যা সন্তানের জন্মকে দুর্ভাগ্য ও লজ্জার কারণ মনে করত। এমনকি কোনো কোনো গোত্র তাদের কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিতেও দ্বিধা করত না। পণ্যদ্রব্যের ন্যায় দাস-দাসী বাজারে বিক্রয় করা হতো এবং তাদের সাথে অমানবিক আচরণ করা হতো। এরকম ভয়াবহ নৈতিক অধঃপতনের পরেও তারা সাহসিকতা, প্রখর স্মৃতিশক্তি, কাব্যচর্চা, বাগ্মিতা, গোত্রপ্রীতি ও আতিথেয়তা প্রভৃতি গুণে গুণান্বিত ছিলো। তাদের মধ্যে কিছু লোক ছিল যারা এক আল্লাহতে বিশ্বাস করত। তারা কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতা থেকে দূরে থাকত, তাদেরকে 'হানীফ' বলা হতো।

এরকম ঘৃণ্য পাপাচার, কুসংস্কার ও বর্বরতায় নিমজ্জিত আরববাসীদের মধ্যে প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) কে প্রেরণ করা হয় বিশ্ববাসীর রহমতস্বরূপ। তিনি সকল নবি-রাসুলগণের মধ্যে সর্বশেষ নবি ও রাসুল। তিনি নবিগণের নবি, আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা (সা.)।

হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর জন্ম ও পরিচয়

আমাদের প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার সুবহে সাদেকের সময় মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। প্রসিদ্ধ মত অনুসারে হস্তিবাহিনীর ঘটনার ৫০ দিন পরে ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম আবদুল্লাহ এবং মাতার নাম আমিনা। তিনি মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় তাঁর পিতা মৃত্যুবরণ করেন। দাদা আব্দুল মুত্তালিব তাঁর নাম রাখেন মুহাম্মাদ এবং স্নেহময়ী মা আমেনা তাঁর নাম রাখেন আহমাদ।

ধাত্রী হালিমার গৃহে শিশু মুহাম্মাদ (সা.)

তৎকালীন আরবের প্রথা অনুসারে শিশু মুহাম্মাদ (সা.)-কে লালন-পালনের জন্য বনু সা'দ গোত্রের বিবি হালিমার নিকট অর্পণ করা হয়। এ সময়ে বিবি হালিমার পরিবার কিছুটা অভাবগ্রস্ত ছিলো। শিশু মুহাম্মাদ (সা.)-এর বরকতে অভাব দূর হয়ে প্রাচুর্যে ভরে ওঠে তার সংসার। পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত বিবি হালিমা তাঁকে নিজ সন্তানের ন্যায় আদর-যত্নে লালন-পালন করেন। এরপর শিশু মুহাম্মাদ (সা.) মা আমেনার গৃহে ফিরে আসেন। মা হালিমার গৃহে অবস্থানকালে শিশু বয়সেই তাঁর মধ্যে ন্যায়বিচারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়। তিনি মাতৃদুগ্ধ পান করার সময় বিবি হালিমার বামপাশের দুগ্ধ পান করতেন। অন্য পাশ থেকে কখনই পান করতেন না; তাঁর দুধ ভাইয়ের জন্য রেখে দিতেন। মা হালিমার গৃহে থাকাকালে ৩ বছর বয়সে দুজন ফেরেশতা তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করে মানবীয় সকল দূর্বলতা মুক্ত করে কুদরতি শক্তি ও প্রজ্ঞা বৃদ্ধি করে দেন। ধাত্রী মা হালিমার প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা-ভক্তি ও ভালোবাসা ছিলো। তিনি নবুওয়াতের দায়িত্ব লাভের পরেও দুধ মা হালিমা ও তাঁর পরিবারকে অত্যন্ত সম্মান ও সহায়তা করতেন।

মা আমেনার মৃত্যু ও এতিম মুহাম্মাদ (সা.)

মাতৃগৃহে ফিরে আসার পর মায়ের সীমাহীন আদর-ভালোবাসায় বালক মুহাম্মাদ (সা.) বড় হতে লাগলেন। তিনি ৬ বছর বয়সে পিতার কবর যিয়ারতের জন্য মায়ের সাথে মদীনায় যান। সেখান থেকে মক্কায় ফেরার পথে মা আমিনা ইন্তেকাল করেন। ফলে তিনি পিতা-মাতা উভয়কে হারিয়ে একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। এসময় দাদা আব্দুল মুত্তালিব এতিম মুহাম্মাদের লালন-পালনের দায়িত্ব নিলেন। দাদা তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ-ভালোবাসায় লালন-পালন করতে থাকেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাঁর আট বছর বয়সে দাদাও ইন্তেকাল করেন। এরপর তিনি চাচা আবু তালেবের তত্ত্বাবধানে বেড়ে উঠতে থাকেন।

আল-আমিন উপাধি লাভ ও বুহাইরা পাদ্রীর ভবিষ্যদ্বাণী

বাল্যকালে মহানবি (সা.)-এর মধ্যে চারিত্রিক উত্তম গুণাবলির বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে। তাঁর কোমল স্বভাব ও অমায়িক ব্যবহারে সবাই তাকে আদর-স্নেহ করতেন। তিনি সবাইকে শ্রদ্ধা করতেন ও ভালোবাসতেন। সর্বদা হাশি-খুশি থাকতেন, সকলের কষ্টে ব্যথিত হতেন। সদা সত্য কথা বলতেন, কখনো মিথ্যা বলতেন না। এজন্য শৈশবেই তাঁকে সবাই আল-আমিন বা বিশ্বাসী উপাধিতে ভূষিত করেন।

১২ বছর বয়সে কিশোর মুহাম্মাদ (সা.) চাচা আবু তালেবের সাথে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া গমন করেন। পথে বুহাইরা নামক জনৈক খ্রিস্টান পাদ্রীর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। খ্রিস্টান পাদ্রী তাঁকে শেষ জামানার নবি ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল হিসেবে চিনতে পারেন। তিনি আবু তালেবকে পরামর্শ দেন তিনি যেন এই বালককে পৌত্তলিক ইয়াহুদিদের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করেন; তাকে মক্কায় পাঠিয়ে দেন। তাই চাচা আবু তালেব পাদ্রীর পরামর্শ মোতাবেক মহানবি (সা.)-কে মক্কায় ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

শান্তি সংঘ প্রতিষ্ঠা ও হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর) স্থাপন

শৈশব থেকেই মহানবি (সা.) আরব জাতির চারিত্রিক অধঃপতন লক্ষ করেছেন। এ সময়ে হরবে ফুজ্জারের ভয়াবহতা দেখে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হন; তাঁর মন বিগলিত হয়। তাই তিনি সমাজের অরাজকতা দূর করে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মনিয়োগ করেন। এ সময় তিনি কতিপয় যুবককে নিয়ে 'হিলফুল ফুযুল' (حِلْفُ الْفُضُوْلِ) নামে একটি যুব শান্তিসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। এ সংঘের মাধ্যমে তিনি মুসাফিরদের নিরাপত্তা, মজলুম ও অসহায়ের সহায়তা এবং অত্যাচারীকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেন। বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন ও আরবে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার চেষ্টা করেন। তিনি যে ভবিষ্যৎ জীবনে শান্তির অগ্রদূত হবেন, এ সাংগঠনিক তৎপরতা তাই প্রমাণ করে।

ছোটবেলা থেকেই মহানবি মুহাম্মাদ (সা.) অনন্যসাধারণ বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিলেন। তিনি যখন একজন যুবক, সে সময় মক্কার গোত্রপ্রধানরা মিলে পবিত্র কা'বা ঘর সংস্কারের কাজ শুরু করেন। কা'বা ঘর সংস্কারের কাজ সমাপ্ত হলে পবিত্র হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর) যথাস্থানে স্থাপন করা নিয়ে গোত্রসমূহের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। অবশেষে গোত্রপ্রধানরা সিদ্ধান্ত নেয় যে, আগামীকাল সকালে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি কা'বা চত্বরে প্রবেশ করবেন, তিনিই এ বিবাদ মীমাংসা করবেন। সকালবেলা হযরত মুহাম্মাদ (সা.) সবার আগে কা'বা চত্বরে প্রবেশ করলেন। এটা দেখে সবাই সন্তুষ্ট হলো। তিনি তাঁর চাদরের মাঝখানে পবিত্র পাথরটি রেখে সকল গোত্রের সরদারকে চাদরের চারপাশ ধরতে বললেন। তারা সকলে মিলে চাদরটি ধরে যথাস্থানে নিয়ে গেল, হযরত মুহাম্মাদ (সা.) নিজ হাতে পাথরখানা কাবার দেয়ালে বসিয়ে দিলেন। ফলে আরব জাতি একটি ভয়াবহ যুদ্ধ থেকে রক্ষা পেল এবং সকলে পাথরটি বসানোর গৌরব লাভ করল।

বিবি খাদিজার সাথে বিবাহ

তৎকালীন আরবে খাদিজা (রা.)-এর সচ্চরিত্রের যথেষ্ঠ সুনাম ছিল। তিনি নিষ্কলুষ চরিত্রের জন্য তাহিরা বা পূণ্যবতী নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি মহানবি মুহাম্মাদ (সা.)-এর সততা ও আমানতদারিতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে তার ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। মহানবি মুহাম্মাদ (সা.)-এর নেতৃত্বে ব্যবসায় প্রচুর সাফল্য আসে। তাছাড়া তাঁর অমায়িক ব্যবহার, সততা ও বুদ্ধিমত্তায় তিনি তাঁর প্রতি আরো বেশি মুগ্ধ হয়ে যান। ফলে খাদিজাতুত তাহিরা তাকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠান। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) চাচা আবু তালেবের পরামর্শে এ প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করলেন। এ সময় খাদিজা (রা.) বয়স ছিল ৪০ বছর আর হযরত মুহাম্মাদ (সা.) -এর বয়স ছিল ২৫ বছর।

মুহাম্মাদ (সা.)-এর নবুওয়াতের দায়িত্ব লাভ

হযরত মুহাম্মাদ (সা.) শৈশব হতেই সমাজকে পাপাচার ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা ভাবতেন। হযরত খাদিজা (রা.)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর তিনি প্রায়শ মক্কার অদূরে হেরা পর্বতের গুহায় গভীর চিন্তায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন। অবশেষে ৪০ বছর বয়সে ৬১০ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র রমযান মাসের ২৭ তারিখ ওহী প্রাপ্ত হন। হযরত জিব্রাঈল (আ.) তাঁকে সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত পাঠ করে শোনান; তিনি নবুওয়াত লাভ করেন। নবুওয়াত লাভের পর তিনি মহান আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত ও ইসলাম প্রচার শুরু করেন।

মহানবি (সা.)-এর শৈশব- কৈশোর থেকে আমাদের শিক্ষণীয়

মহানবি (সা.) -এর শৈশব-কৈশোরের অনুপম চরিত্রিক মাধুর্যে আমাদের জন্য অনুসরণীয় অসংখ্য দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে; তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো-

১। আমরা ন্যায়বিচার করব ও অপরের অধিকার আদায়ে সর্বদা সচেষ্ট হবো;

২। ছোট-বড় সকলের সাথে উত্তম ব্যবহার করব, সকলকে সম্মান করব ও ভালোবাসবো; কাউকে অপমান করব না;

৩। সর্বদা কঠোর পরিশ্রম করব; পরিবারের কাজে সহযোগিতা করব;

৪। পরিবার ও সমাজে শান্তিবিনষ্টকারী কোনো আচরণ করব না;

৫। সদা সত্য কথা বলব; কারও আমানত নষ্ট করব না;

৬। বন্ধু ও সহপাঠীরা মিলে ভালো কাজ করার চেষ্টা করব; কোনো অন্যায় করব না;

৭। অসহায় ও অত্যাচারিত মানুষকে সাহায্য করব এবং অত্যাচারীকে প্রতিহত করব;

৮। সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার চেষ্টা করব;

৯। সর্বোপরি ইসলামি আদর্শে নিজেদের জীবন গড়ব।

হযরত আবু বকর (রা.)

জন্ম ও পরিচয়

হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন ইসলামের প্রথম খলিফা। তিনি মক্কার প্রসিদ্ধ কুরাইশ বংশের তায়িম গোত্রে ৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম আব্দুল্লাহ, উপনাম আবু বকর এবং উপাধি সিদ্দিক বা সত্যবাদী। হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন বয়সের দিক থেকে হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর চেয়ে তিন বছরের ছোট। মহানবি (সা.)-এর প্রায় সমবয়সী হওয়ায় বাল্যকাল থেকে হযরত আবু বকর (রা.)-এর সঙ্গে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব ছিল। তিনি উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা (রা.)-এর পিতা।

হযরত আবু বকর (রা.) এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা

একদা হযরত আবু বকর (রা.) ব্যবসার উদ্দেশ্যে ইয়েমেনে গমন করেন। মক্কায় ফিরে শুনলেন হযরত মুহাম্মাদ (সা.) নবুওয়াতপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং ইসলাম ধর্ম প্রচার শুরু করেছেন। এ ঘটনার কথা শুনে সাথে সাথেই তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.) এর দরবারে হাজির হয়ে কালেমা শাহাদাত বাণী উচ্চারণ করে ইসলাম গ্রহণ করেন। মহানবি (সা.) বলেছেন, আমি যাকেই ইসলামের দাওয়াত দিয়েছি, তার মধ্যেই কিছুটা সংকোচ লক্ষ্য করেছি, কেবল আবু বকর ছাড়া। তিনি ইসলামের আহ্বানে নির্দ্বিধায় তাৎক্ষণিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেন। এছাড়া মিরাজের অলৌকিক ঘটনা উল্লেখ করে কাফিরগণ আবু বকর (রা.) কে বললেন, এবার কী বলবে, তোমার বন্ধু বলেছে উনি নাকি এক রাতে সিরিয়া গিয়ে আবার ফেরতও এসেছেন। আবু বকর (রা.) বললেন, মহানবি (সা.) যদি বলেন, সাত আসমানের ওপরে গিয়েছেন, তবুও আমি বিশ্বাস করি। তখন মহানবি (সা.) তাকে 'সিদ্দিক' বা মহাসত্যবাদী উপাধি দেন।

চারিত্রিক গুণাবলি

হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন স্বল্পভাষী, ধৈর্যশীল, সাহসী, পরোপকারী, বিচক্ষণ, দয়ালু, বৃদ্ধদের প্রতি যত্নশীল। তিনি যখন খোলাফায়ে রাশেদিনের খলিফা ছিলেন, তখনকার একটা ঘটনা তোমাদের সামনে তুলে ধরছি। মদিনায় বসবাস করতেন এক অসহায় বৃদ্ধ অন্ধ মহিলা। তিনি খুবই নিঃস্ব ও হতদরিদ্র এবং বয়সের ভারে দুর্বল ছিলেন। বৃদ্ধার কোনো আত্মীয়স্বজন ছিল না। বৃদ্ধার করুণ অবস্থা শুনে হযরত উমর (রা.) তার সেবা করা শুরু করলেন। প্রতিদিন তাকে খাওয়ানো ও অন্যান্য যত্ন শুরু করলেন। হঠাৎ একদিন দেখলেন, বৃদ্ধার সকল কাজ কেউ করে গেছে। দ্বিতীয় দিনও দেখলেন, বৃদ্ধার যত্ন করা হয়ে গেছে। তখন বৃদ্ধাকে হযরত উমর (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, কে তার এই সকল কাজ করেছেন। তখন বৃদ্ধা বললো, আমি তো চোখে দেখি না তবে লোকটি খুব যত্নের সঙ্গে আমার সকল কাজ করেছেন এবং তিনি খুব ভালো ব্যবহার করেছেন। হযরত উমর (রা.) বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবলেন কে এই কাজ করেছেন? তিনি গোপনে পরের দিন দেখলেন, স্বয়ং খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) অতিযত্নে অসহায় অন্ধ বৃদ্ধা মহিলার সমস্ত কাজকর্ম সম্পন্ন করে চলে যাচ্ছেন।

হযরত আবু বকর (রা.) ইসলামের প্রথম মুসলিম পুরুষ। ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি সিদ্দিক (সত্যবাদী) এবং আতিক (দানশীল) উপাধি লাভ করেছিলেন। নবি করিম হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর ওফাতের তিনি প্রথম খলিফার দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্ব ও শাসনের ফলে ইসলামের শত্রুরা ধ্বংস হয়েছিল। হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর শাসনামলে মুসলিম সাম্রাজ্য অনেক শক্তিশালী করেন। ইসলামের ইতিহাসে এই মহান ব্যক্তিত্বের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

দলগত কাজ: হযরত আবু বকর (রা.) এর উত্তম চরিত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে একটি তালিকা তৈরি করো এবং নিজেদের জীবনে অনুশীলন করো।

● হযরত খাদিজা (রা.)

জন্ম ও পরিচয়

হযরত খাদিজা (রা.) ছিলেন মহানবি (সা.)–এর প্রথম স্ত্রী। তিনি বিখ্যাত কুরাইশ বংশের আবদুল উযয্যা নামক পরিবারে ৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বের ইতিহাসে যে কয়জন সম্মানিত নারী রয়েছেন, তিনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

হযরত খাদিজা (রা.) আরবের একজন স্বনামধন্য ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর বিভিন্ন পণ্যের আমদানি-রপ্তানির ব্যবসায় তৎকালীন শাম দেশ তথা বর্তমান সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। হযরত খাদিজা (রা.) তাঁর ব্যবসা পরিচালনার জন্য বিভিন্ন সময় লোক নিয়োগ করতেন। তিনি মহানবি (সা.)-এর সততা, আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার কথা শুনে তাঁকে তাঁর ব্যবসা দেখাশোনা করার জন্য অনুরোধ করেন। মহানবি (সা.) তাঁর ব্যবসার দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর ব্যবসায় প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়।

মুহাম্মাদ (সা.)-এর সাথে বিবাহ

হযরত খাদিজা (রা.) যুবক মুহাম্মাদ (সা.)-এর সততা, বিশ্বস্ততা, উন্নত চরিত্র ও বুদ্ধিমত্তায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাব দেন। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর চাচা আবু তালিবের সম্মতিক্রমে ২০টি উট মাহরের বিনিময়ে এ বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিবাহের পর হযরত খাদিজা (রা.) তাঁর সকল সম্পদের দায়দায়িত্ব রাসুল (সা.)-এর উপর ছেড়ে দেন এবং তাঁকে ইচ্ছামতো সম্পদ খরচ করার অনুমতি দেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) ঐ সম্পদ অসহায় ও গরীব-দুঃখীদের মাঝে বিলিয়ে দেন।

চারিত্রিক গুণাবলি

তিনি একজন আদর্শ নারী, আদর্শ স্ত্রী, আদর্শ ব্যবসায়ী ও আদর্শ মা ছিলেন। হযরত খাদিজা (রা.) জাহিলি যুগে জন্মগ্রহণ করেও সৎ চরিত্রের অধিকারি ছিলেন। কখনো কোনো অন্যায় ও অসৎ কাজ করেননি। মহানবি (সা.) –এর প্রতি তাঁর প্রবল ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা ছিল।

তিনি নারীদের কল্যাণমূলক কাজে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেন। তিনি বিধবা নারীদেরকে আশ্রয় দিতেন ও অবহেলিত নারীদেরকে নিজ বাড়িতে শিক্ষা দিতেন। তিনি অবসর সময়ে সেলাই করতেন।

তিনি ছিলেন একজন দানশীল ও দয়ালু ব্যক্তি। তিনি শিশু, অসহায় ও এতিমদের ভালোবাসতেন। ইসলামের কল্যাণে তাঁর সকল সম্পদ দান করার কারণে আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন। হযরত খাদিজা (রা.)–এর স্বামীভক্তি ছিল অতুলনীয়। তিনি রাসুল (সা.)-এর সকল কাজে শক্তি ও সাহস যোগাতেন। বিপদে-আপদে কাছে থাকতেন, তাঁকে সান্ত্বনা দিতেন।

হযরত খাদিজা (রা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব

হযরত খাদিজা (রা.) নারীকুলের গৌরব। তিনি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তি। ইসলাম প্রচারে তাঁর অবদান ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। তিনি জীবিতকালেই বেহেশতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন। খাদিজা (রা.)-এর কন্যা ফাতিমা (রা.) জান্নাতে নারীদের সর্দার। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর সম্মানে বলেন, 'আল্লাহ খাদিজার চেয়ে কোনো মহৎ নারী আমাকে দেননি। তিনি এমন সময় আমাকে বিশ্বাস করেছিলেন, যখন সবাই আমাকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করেছিল। আমার বিপদের সময় সবাই যখন আমাকে পরিত্যাগ করেছে, তখন তিনি আমাকে সমর্থন ও অর্থ সাহায্য করেছেন।' (মুসনাদে আহমদ) মহানবি (সা.) থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, 'বিশ্বের সকল নারীর উপর যে চারজন নারীর সম্মান রয়েছে তন্মধ্যে হযরত খাদিজা (রা.) অন্যতম।'

হযরত খাদিজা (রা.) ছিলেন রাসুল (সা.)-এর সকল বিপদের বিশ্বস্ত সাথী ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু। জাহেলী যুগের কোন প্রকার অন্যায় ও পাপ তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। তাঁর উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আজও বিশ্বের নারীদের জন্য অনুপম আদর্শ।

দলগত কাজ: বিবি খাদিজা (রা.) -এর চরিত্রের উত্তম গুণাবলির আলোকে একটি পোস্টার তৈরি করো।

● ইমাম আবু হানিফা (রহ.)

যে সকল মনীষী তাঁদের জ্ঞান-গবেষণার জন্য মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন, ইমাম আবু হানিফা (রহ.) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁকে ফিকহ শাস্ত্রের জনক বলে হয়। প্রিয় শিক্ষার্থী, আজ আমরা তাঁর জীবনাদর্শ জানব।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ৮০ হিজরি সনের ৪ শা'বান মোতাবেক ৭০০ খ্রিস্টাব্দে ইরাকের কুফা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম নুমান, পিতার নাম সাবিত। দাদার নামানুসারে তাঁর নাম রাখা হয় নুমান। তিনিই পরবর্তীতে ইমাম আযম আবু হানিফা নামে জগদ্বিখ্যাত হন।

জ্ঞানার্জন

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী। একবার যা পড়তেন বা শুনতেন তা মুখস্থ হয়ে যেতো। তিনি বাল্যকালেই পবিত্র কুরআন হিফয করেছিলেন। ইমাম শা'বীর পরামর্শে তিনি ইলমুল কালাম, পবিত্র কুরআন, হাদিস ও ফিকহ শাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি মক্কা, মদিনা, কুফা, বসরা ও সিরিয়ার বিখ্যাত মুহাদ্দিসগণের নিকট হতে হাদিসের জ্ঞান লাভ করেন। পবিত্র হজ উপলক্ষে মক্কা শরীফে এলে বিভিন্ন দেশের মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের সাথে জ্ঞানের আদান-প্রদান করতেন। তিনি কয়েকজন সাহাবির সাক্ষাত পান। তাই তাকে তাবে'ঈ গণ্য করা হয়।

ফিকহ শাস্ত্রে অবদান

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ফিকহ শাস্ত্রের উদ্ভাবক এবং হানাফি মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ইবাদাত ও আমলসমূহ আমরা যাতে সঠিকভাবে পালন করতে পারি সেজন্য তিনি কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত শরীয়াতের বিধি-বিধানকে অত্যন্ত সহজ করে গ্রন্থিত করেন। এজন্যই বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমান তাঁর মাযহাবকে অনুসরণ করেন। তাঁর উদ্ভাবিত ফাতওয়া হানাফি মাযহাবের বিখ্যাত গ্রন্থসমুহে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তিনি মুসলিম উম্মাহর জন্য প্রায় ৮৩ হাজার মাসআলার সমাধান করে গেছেন। তাঁর মাযহাবই সারা বিশ্বে সমাদৃত ও সহজ পালনীয়। ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মাদ, ইমাম যুফারসহ আরো অনেক প্রসিদ্ধ ফকীহ তাঁর শিষ্য ছিলেন। ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর অবদানের মূল্যায়ন করতে গিয়ে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি ইলম ফিকহের ব্যাপক জ্ঞানার্জন করতে চায় সে যেন অবশ্যই ইমাম আবু হানিফা ও তাঁর শিষ্যদের সান্নিধ্য গ্রহণ করে। ইমাম আবু হানিফা হাদিস শাস্ত্রে 'হাফেযুল হাদিস' ছিলেন। তার সহিহ হাদিস সংকলন- 'মুসনাদ আল-ইমাম আবি হানিফাহ' একটি অমূল্য গ্রন্থ।

চারিত্রিক গুণাবলি

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) অনুপম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি নিয়মিত রাত্রি জাগরণ করে তাহাজ্জুদ সালাত ও আল্লাহর যিকির করতেন। তিনি কখন গিবত বা পরনিন্দা করতেন না। কখনও কারো সম্পর্কে আলোচনা করলে তার ভালো দিকটাই আলোচনা করতেন।

তিনি একজন সফল ব্যবসায়ী ছিলেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে সর্বদা সততা বজায় রাখতেন; পণ্যের দোষ-ত্রুটি কখনও গোপন করতেন না। তিনি ওয়াদা ও আমানত রক্ষা করতেন। ঋণী ব্যক্তিকে অবকাশ দিতেন, অধিকাংশ সময় তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন। তিনি খুব সাদাসিধা ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন। তিনি খুব নম্র ও বিনয়ী ছিলেন।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) একজন মুত্তাকী ও পরহিযগার ছিলেন। হারাম বা নিষিদ্ধ বিষয় থেকে সবসময় নিজেকে পবিত্র রাখতেন। অধিকাংশ সময় চিন্তামগ্ন ও চুপ থাকতেন। তিনি দানশীল ও দয়ালু ছিলেন।

পার্থিব প্রভাব-প্রতিপত্তিকে তিনি অত্যন্ত তুচ্ছ মনে করতেন। তাঁকে খলিফা মানসুর বাগদাদের প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণ করার প্রস্তাব দিলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। এ জন্য খলিফা তাঁকে জেলে আটক করে রাখেন। কোন কিছুতেই রাজি করাতে না পেরে খলিফা তাঁকে গোপনে বিষ প্রয়োগ করেন। এই বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে তিনি ১৫০ হিজরিতে সিজদাহরত অবস্থায় ইন্তেকাল করেন।

আমরা এই মহান মনীষীর জীবনাদর্শ ভালভাবে জানব এবং তাঁর উন্নত নৈতিক আচরণগুলো নিজেদের জীবনে বাস্তবায়নে সচেষ্ট হবো।

দলগত কাজ: ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর চরিত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করো এবং নিজেদের জীবনে অনুশীলন করো।

● হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.)

হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) ইসলামের অন্যতম প্রধান সাধক ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি গাউসূল আজম বড় পীর হিসেবেই সকলের নিকট পরিচিত। প্রিয় শিক্ষার্থী, আমরা আজ ইসলামের এ মহান সাধকের জীবনাদর্শ সম্পর্কে জানব।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) হিজরী ৪৭০ সালে রমযান মাসের ১ তারিখ মোতাবেক ১০৭৭ খ্রিস্টাব্দে পারস্যের জিলান শহরে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মভূমি জিলানের নামানুসারেই তাঁকে জিলানী বলা হয়। তাঁর উপাধি গাউসুল আযম, মুহিউদ্দিন বা দীনের পুনরুজ্জীবক ইত্যাদি। তাঁর পিতা আবু সালেহ মুসা জঙ্গী এবং মাতা উম্মুল খায়ের ফাতিমা। তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.) -এর বংশধর ছিলেন।

ব্যতিক্রমী শৈশব

শৈশবে হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) -এর মধ্যে শিশুসুলভ চাঞ্চল্য ছিল না। তিনি ছিলেন শান্ত, নম্র, ভদ্র ও স্থির স্বভাবের অধিকারী। জনশ্রুতি রয়েছে যে, তিনি মায়ের কোলে থাকতে শুনেশুনে ১৮ পারা কুরআন মাজিদ মুখস্থ করে ফেলেন। সাত বছর বয়স থেকে তাহাজ্জুদ নামায পড়তে শুরু করেন।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের পর তিনি ১৮ বছর বয়সে বাগদাদের বিশ্ববিখ্যাত নিজামিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। এখান থেকে তিনি তাফসির, হাদিস, ফিকহ, আরবি সাহিত্য, ইতিহাস ও আকিদা বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য লাভ করেন।

সত্যবাদিতা

তিনি সদা সত্য কথা বলতেন, কখনো মিথ্যা বলতেন না। তিনি পড়াশুনার জন্য ব্যবসায়ী কাফেলার সাথে বাগদাদ আসার পথে একটি ডাকাত দলের কবলে পড়েন। ডাকাত সর্দার অন্যদের সবকিছু নিয়ে যাওয়ার পর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার সাথে কি আছে? তিনি বললেন, আমার নিকট ৪০টি স্বর্ণ মুদ্রা আছে। ডাকাত সর্দার আশ্চার্যন্বিত হয়ে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন হে যুবক! তুমি তো মিথ্যা কথা বলে আমার নিকট থেকে স্বর্ণ মুদ্রা লুকাতে পারতে? তখন হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) বললেন, আমার মা মিথ্যা কথা বলতে নিষেধ করেছেন। তাঁর এ সত্যবাদিতা দেখে ডাকাত দলের মনে পরিবর্তন আসল এবং তারা সবাই তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে এ পাপের পথ ছেড়ে দিলো এবং পূণ্যের পথে তাদের জীবন পরিচলনা শুরু করল।

অধ্যাত্মিক সাধনা ও ইসলাম প্রচার

হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) একজন মহান সাধক ছিলেন। তিনি তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সুফিসাধক হযরত হাম্মাদ (র.)-এর নিকট সুফিতত্ত্বে জ্ঞানলাভ করেন। তিনি একটানা ২৫ বছর মুরাকাবা-মুশাহাদা ও কঠোর আধ্যাত্মিক সাধনায় নিয়োজিত থাকেন।

তিনি জীবনের বাকী সবটুকু সময় ইসলামের সেবায় নিয়োগ করেন। তিনি বিভিন্ন জনসভার আয়োজন করে বক্তৃতা ও উপদেশ দিতে থাকেন। মুসলমানদের পাশাপাশি অমুসলিমরাও তাঁর সভায় আসতেন। তাঁর দাওয়াতে প্রায় ৫ হাজার অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছেন বলে জানা যায়। পরবর্তীতে তিনি তাঁর শিষ্যদের নিয়ে একটি মুবাল্লিগ দল তৈরি করেন। তাদের দাওয়াতে বিমোহিত হয়ে সুদান, নাইজেরিয়া, চাদ, ক্যামেরুনের অসংখ্য মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি প্রায় এগারোটি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি আরবি ও ফার্সি ভাষায় কবিতা রচনা করেন।

ইবাদাত

হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কঠোর সাধনা করতেন। প্রত্যহ কুরআন মাজিদ তিলাওয়াত করতেন; রাতের অধিকাংশ সময় জিকির ও ইবাদাত বন্দেগীতে কাটাতেন। নিষিদ্ধ পাঁচ দিন ব্যতীত সারা বছরই তিনি রোযা পালন করতেন।

অসহায়দের সাহায্য

তিনি গরীব-দুঃখী ও অসহায় মানুষের সেবা করতেন; তাদেরকে অকাতরে দান করতেন। তাঁর শিক্ষাজীবনে একবার বাগদাদে অভাব দেখা দেয়। তিনি তাঁর সকল স্বর্ণমুদ্রা গরীব-দুঃখী ও অসহায় মানুষকে দান করে দেন এবং নিজে না খেয়ে জীবন অতিবাহিত করেন। তিনি নিজে পেটপুরে খাওয়া আর প্রতিবেশি অনাহারে থাকাকে অপছন্দ করতেন।

মৃত্যু

ইসলামের এ মহান সেবক ৯০ বছর বয়সে ৫৬১ হিজরী সনের ১১ রবিউসসানি ইন্তেকাল করেন। বর্তমান ইরাকের বাগদাদ শহরে তাঁর মাজার রয়েছে।

এ পাঠ থেকে আমাদের জন্য শিক্ষণীয়:

- আমরা বড়পীর হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রা.) -এর আদর্শে আমাদের জীবন গড়ব;
- সদা সর্বদা সত্য কথা বলব, কখনও মিথ্যাচার করবো না;
- গরীব, অসহায়, অভাবী ও দুস্থদের সাহায্য ও সেবা করব;
- মাতাপিতার কথা শুনব, তাঁদের আদেশ মেনে চলব;
- মহান আল্লাহর ইবাদাত করব।

দলগত কাজ: শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.)-এর জীবনাদর্শ থেকে নিজেদের জন্য পালনীয় কাজের একটি তালিকা তৈরি করবে।

প্রতিবেদন রচনা

আদর্শ জীবনচরিত অধ্যায় থেকে আমরা যা কিছু শিখলাম এবং যে সকল কাজ করলাম সেগুলো মিলিয়ে আমাদের এবার একটি বড় কাজ করতে হবে। এবার আমরা নিজেরা ঠিক করব যে আমরা এসকল আদর্শ জীবনচরিত থেকে কি শিক্ষা লাভ করলাম এবং সেগুলো কোন কোনটি আমরা আমাদের জীবনে প্রয়োগ করতে চাই। অর্থাৎ এখন তোমাকে ভেবে দেখতে হবে, মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.), হযরত আবু বকর (রা.), হযরত খাদিজা (রা.), ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এবং হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) এর জীবন সম্পর্কে তুমি যা যা জেনেছো তার মধ্যে থেকে কি কি কাজ তুমি তোমার জীবনে চর্চা করতে চাও। তাহলে এখন তোমার কাজ হলো-

কাজ-১৫: জীবনাদর্শ থেকে তুমি অনুসরণ করতে চাও এমন দিকগুলো নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করো।

অর্থাৎ আমাদের এখন ঠিক করতে হবে যে, জীবনীগুলো থেকে আমরা যা যা জানলাম সেগুলোর মধ্যে থেকে বিশেষ কোনগুলোর প্রতিফলন আমরা আমাদের জীবনে দেখতে চাই। সেই দিকগুলোকে তুলে নিয়ে আমরা এবার একটি প্রতিবেদন তৈরি করব এবং শিক্ষককে দেখিয়ে নিয়ে নিজের কাছে রেখে দিবো। যা যা লিখেছি সেই অনুসারে আমরা এবার আমাদের জীবনকে পরিবর্তনের চেষ্টা করব। সময়ে সময়ে আমরা আমাদের এই প্রতিবেদনের লেখার সাথে মিলিয়ে দেখব যে যা যা অনুসরণ করতে চেয়েছিলাম সেগুলো আসলেই অনুসরণ করতে পেরেছি কিনা। না পেরে থাকলে সেগুলো আবার নতুন করে চর্চা শুরু করব।